بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ০৪ তবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

যারা নিজেরা আহত হবার পরও আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মান্য করে, তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর হযরত যুবায়ের (রা.)'র স্মৃতিচারণ কিছুটা বাকি ছিল, আজ সেই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করব। আমি এখনই যে আয়াত পাঠ করেছি সে আয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) তার ভাগ্নে উরওয়া (রা.)-কে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তোমার পিতৃপুরুষ হযরত যুবায়ের ও হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াতে উল্লিখিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যখন আহত হন এবং মুশরিকরা পশ্চাদপসরণ করে তখন তিনি (সা.) আশঙ্কা অনুভব করেন, তারা পুনরায় ফিরে এসে আক্রমন করে না বসে। এজন্য তিনি (সা.) বলেন, তাদের পিছু ধাওয়া করতে কে কে যাবে? তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান। রাবী বলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত যুবায়ের (রা.)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত আবু বকর ও হযরত যুবায়ের (রা.) উভয়ই আহতদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহীহ্ মুসলিমে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হিশাম তার পিতার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে বলেছেন, তোমাদের পিতৃপুরুষ সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা আহত হবার পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে লাব্বায়েক বলেছে (তথা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে)। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজ কানে মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, **তালহা ও যুবায়ের জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে**। হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম– এর যে পদমর্যাদা ছিল তা হলো, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখভাগে যুদ্ধ করতেন আর নামাযে তাঁর (সা.) পিছনে দাঁড়াতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আখনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)'র উল্লেখ করে এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু কটুক্তি করে, তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি এটি নিঃসন্দেহে তাঁর (সা.) কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, দশজন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। মহানবী (সা.) জান্নাতে থাকবেন, হযরত আবু

বকর জান্নাতে থাকবেন, হযরত উমর জান্নাতে থাকবেন, হযরত উসমান জান্নাতে থাকবেন, হযরত আলী জান্নাতে থাকবেন, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত সা'দ বিন মালেক এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম জান্নাতে থাকবেন। আর আমি চাইলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করে দশম ব্যক্তি কে? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, কয়েকজন পুনরায় জিজ্ঞেস করে, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সাঈদ বিন যায়েদ, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং। হযরত তালহা (রা.)'র স্মৃতিচারণেও সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওহী লেখকগণের নাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হতো, তা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা হতো। অতএব মহানবী (সা.) যেসব লেখককে দিয়ে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন তাদের মাঝে নিম্নলিখিত পনেরো জনের নাম ঐতিহাসিকভাবে সাব্যস্ত–

যায়েদ বিন সাবেত, উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্, যুবায়ের বিন আওয়াম, খালেদ বিন সাঈদ বিন আস, হিব্বান বিন সাঈদুল আস, হানযালাহ্ বিন রবি'উল আসাদী, মুইকিব বিন আবি ফাতেমা, আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম আয্যুহরী, শুরাহ্বিল বিন হাসানা, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি (সা.) তাদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে এক যুদ্ধাভিযানে চুলকানির বা খুজলির কারণে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় বাড়ি-ঘরের সীমানা নির্ধারণ করছিলেন, তখন হযরত যুবায়ের (রা.)'র জন্য জমির একটি বড় অংশ বরাদ্দ করেন। তিনি (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে একটি খেজুরের বাগানও দিয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যুবায়ের বিন আওয়ামকে মহানবী (সা.)-এর জমি হেবা করা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন,

মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে সরকারী জমি থেকে একটি এত বড় ভূমিখণ্ড প্রদান করেন যাতে হযরত যুবায়েরের ঘোড়া দম শেষ হওয়া পর্যন্ত দৌড়াতে পারত, অর্থাৎ সেটির পক্ষে যতটুকু দৌড়ানো সম্ভব ছিল সে পর্যন্ত। হযরত যুবায়েরের ঘোড়া যেখানে গিয়ে থামে, সেখান থেকে তিনি নিজের চাবুক খুব জোরে উপরে নিক্ষেপ করেন এবং মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, তাঁকে কেবল ঐ সীমা পর্যন্ত জমি-ই প্রদান করা হবে না, যেখানে তার ঘোড়া গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বরং যেখানে তার চাবুক পড়েছে, সে স্থান পর্যন্ত তাকে ভূমিখণ্ড প্রদান করা হোক। তিনি (রা.) লিখেন, আমাদের দেশের ঘোড়াও কয়েক মাইল দৌড়াতে পারে, আর আরবের ঘোড়া তো খুবই দ্রুতগামী হয়ে থাকে। উক্ত ঘোড়া যদি চার-পাঁচ মাইলও দৌড়াতে পারে বলে ধরা হয়, তাহলে উক্ত জমির ব্যাপ্তি হয় প্রায় বিশ হাজার একর, যা তাকে প্রদান করা হয়েছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ তার কিতাবুল খিরাজ পুস্তকে লিখেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে একটি ভূমিখণ্ড প্রদান করেন যেখানে খেজুরের বাগানও ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও ইমাম আবু ইউসুফের বরাতে একই বিষয় বর্ণনা করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, তাকে যে ভূমিখণ্ড প্রদান করা হয়েছিল, সেখানে খেজুরের বাগানও ছিল আর সেটি কোন এক সময় ইহুদি গোত্র বনু নযিরের মালিকানাধীন ছিল। সেটিকে জুর্‌ফ বলা হতো [জুর্‌ফ সিরিয়ার রাস্তায় মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম] অর্থাৎ তা একটি স্থায়ী গ্রাম ছিল। পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর সাথে এই হাদীসকে যদি আমরা মিলিয়ে দেখি তাহলে এটি থেকে এই ফলাফলই বের হয় যে, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে উক্ত বিশ হাজার একর ভূমি প্রদান করেছিলেন অথচ তিনি পূর্ব থেকেই, একটি গ্রামের মালিক ছিলেন, যাতে খেজুরের বাগানও ছিল।

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত, মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, যে বছর নক্‌সীর বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ার রোগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)ও উক্ত রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হন। এমনকি তা তাকে হজ্জ করা থেকে বিরত রাখে আর তিনি ওসীয়্যতও করেন। তখন কুরাইশদের কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিন; অর্থাৎ অবস্থা খুবই শোচনীয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মানুষ কি একথা বলাবলি করছে? সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তারা কাকে খলীফা বানাতে চায়? সে ব্যক্তি চুপ থাকে। এরই মাঝে আরেকজন তাঁর কাছে আসে। বর্ণনাকরী বলেন, আমার মনে হয় সে হারেস ছিল। তিনি বলেন, কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, একথা কি লোকেরা বলছে? সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ, অর্থাৎ তাঁর পর কে খলীফা হবেন (তা নির্ধারণ করতে বলা হচ্ছে)। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কে খলীফা হবেন? তিনি নীরব থাকেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে বলেন, তারা সম্ভবত যুবায়ের (রা.)-কে মনোনীত করতে বলছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার জানামতে তিনি অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.) ঐসব লোকের মাঝে নিশ্চিতভাবে উত্তম এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছেও সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলতেন, একবার তাঁর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক আনসারী সাহাবীর মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে পানির নালা সম্পর্কে মতভেদ হয় যদ্বারা তারা উভয়ে তাদের ক্ষেতে সেচ দিতেন। মহানবী (সা.) বিষয়টি মীমাংসার উদ্দেশ্যে বলেন, হে যুবায়ের! তোমার ক্ষেতে সেচ দেয়ার পর তুমি তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও। কিন্তু আনসারীর কাছে এ কথাটি মনঃপূত হয় নি। তাই সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সে আপনার ফুপাত ভাই, তাই আপনি এমন সিদ্ধান্ত দিলেন, তাই না? একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার রং পাল্টে যায় আর তিনি (সা.) যুবায়ের (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, এখন তুমি তোমার ক্ষেতে সেচ দিতে থাক আর পানি আল পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি পানি আটকে রাখ। এভাবে মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তার পুরো অধিকার পাইয়ে দেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তার ও আনসারীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু আনসারী যখন মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তখন মহানবী (সা.) সঠিক নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তার পুরো অধিকার পাইয়ে দেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি মনে করি নিম্নলিখিত আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(সূরা আন্ নিসা: ৬৬)

অর্থাৎ, অসম্ভব! তোমার প্রভুর কসম! তারা কখনোই ঈমান আনতে পারে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে সেসব বিষয়ে বিচারক মানবে যেগুলোতে তাদের মাঝে বিবাদ হয়েছে। অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্তই প্রদান কর, সে বিষয়ে তারা যেন নিজ হৃদয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করে।

হযরত যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এই আয়াত ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (সূরা আয্ যুমার: ৩২) অর্থাৎ, অবশ্যই তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের সমীপে একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে– অবতীর্ণ হয়, তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর দ্বারা কি আমাদের জাগতিক ঝগড়া-বিবাদ বুঝাচ্ছে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ।

এরপর যখন এই আয়াত ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (সূরা আত্ তাকাসূর: ০৯) অর্থাৎ সেদিন তোমরা অবশ্যই নিয়ামত ও প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে– অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কোন্ প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? আমাদের কাছে তো কেবল খেজুর আর পানিই রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, সাবধান! সেই প্রাচুর্যের যুগও অচিরেই আসতে যাচ্ছে। এখন কষ্ট ও কাঠিন্যের যুগ চলছে, (এরপর) ইনশাআল্লাহ্ স্বাচ্ছন্দ্যের যুগও আসতে যাচ্ছে।

হাব্‌স বিন খালেদ বলেন, আমার কাছে সেই বুযূর্গ এই হাদীস বর্ণনা করেন যিনি মসুল থেকে আমাদের কাছে আসতেন। মসুল সিরিয়ার একটি বিখ্যাত শহর, যা বিপুল জনবসতি ও বিশাল আয়তনের দিক থেকে তৎকালে ইসলামী বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব রাখতো; বিভিন্ন শহর থেকে সেখানে লোকজন আসতো। এটি নিনেভার নিকটে দজলা নদীর তীরে ও বাগদাদ থেকে ২২২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। অভিধানে এই শহরের পরিচয় এটাই লেখা হয়েছে। যাহোক, তিনি বর্ণনা করেন, মসুল থেকে সেই বুযূর্গ আমাদের কাছে আসতেন। তিনি বলেন, আমি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র সাথে কতিপয় সফর করেছি। একবারের ঘটনা, কোন এক মরুভূমিতে তার গোসলের প্রয়োজন হলে তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা কর। আমি তার জন্য কাপড় দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করি। তিনি গোসল আরম্ভ করেন। হঠাৎ তার দেহের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে। আমি দেখলাম, তার সারা দেহ তরবারির আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ। আমি তাকে বললাম, খোদার কসম! আপনার শরীরে আঘাতের এমন চিহ্ন আমি দেখেছি যা আজকের পূর্বে কখনো কারো শরীরে দেখি নি! তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তুমি কি আমার শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো দেখে ফেলেছ? তারপর বলেন, **খোদার কসম! সবক'টি আঘাত আমি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার সময় পেয়েছি।**

হযরত উসমান, হযরত মিক্বদাদ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে ওসীয়্যত করে রেখেছিলেন, এজন্য তিনি তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং নিজ সম্পদ থেকে তাদের সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। যেহেতু তিনি সচ্ছল ছিলেন, তাই তাদের সন্তানদের জন্য তাদের সম্পদ খরচ করতেন না, বরং নিজের পক্ষ থেকে খরচ করতেন, যেন সেই সম্পদ পরবর্তীতে তাদের কাজে লাগে; তার কোনরকম লোভ-লালসা ছিল না। হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে জানা যায় যে, তার এক হাজার দাস ছিল, যারা তাকে ভূমিজ ফসল উৎপাদনের কর প্রদান করত; এগুলোর কিছুই তিনি বাড়িতে আনতেন না, পুরোটাই সদকা করে দিতেন। মুতী বিন

আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, হযরত যুবায়ের (রা.) ধর্মের স্তম্ভগুলোর মধ্যকার একটি স্তম্ভ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের যখন উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন দণ্ডায়মান হন, তখন তিনি আমাকে ডাকেন। আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি বলেন, হে প্রিয় পুত্র! আজকে হয় অত্যাচারী ব্যক্তি নিহত হবে, নতুবা অত্যাচারিত ব্যক্তি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আজ আমি নিপীড়িত অবস্থায় নিহত হব। আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো নিজের ঋণ নিয়ে। তোমার কি মনে হয় আমার ঋণ পরিশোধ করার পরও কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে? এরপর বলেন, হে আমার পুত্র! সম্পদ বিক্রি করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও; আর আমি এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করছি। ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাথেকে এক-তৃতীয়াংশ তোমার সন্তানদের জন্য। অর্থাৎ অন্যদের পাশাপাশি তার সন্তানদেরও তিনি দান করেন। হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)'র ছেলেরা বয়সে হযরত যুবায়েরের ছেলে খুবায়েব ও আব্বাদের সমান ছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্র ছেলেরা বয়সে হযরত যুবায়েরের নিজের ছেলেদের সমান ছিলেন। অর্থাৎ ছেলের ঘরের নাতি যারা ছিল, তারাও তার (অর্থাৎ ছেলের) ভাইদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)'র নয়জন কন্যা ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের আমাকে তার ঋণ সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন, **হে আমার পুত্র, যদি এই ঋণের কোন অংশ পরিশোধ করতে তুমি অপারগ হও, তবে আমার মওলার সাহায্য নিও। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, মওলা বলতে তিনি কী বুঝাতে চেয়েছিলেন– তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মওলা কে? এতে হযরত যুবায়ের বলেন, 'আল্লাহ্'। পরবর্তীতে যখনই আমি তার ঋণ নিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছি, তখন এ দোয়া করেছি যে, হে যুবায়ের-এর মওলা! তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং তিনি তা পরিশোধ করে দিতেন।** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই ঋণ পরিশোধের কোন না কোন ব্যবস্থা কিংবা উপকরণ সৃষ্টি করে দিতেন। তার যেহেতু সম্পদ ছিল তাই তা থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত। হযরত যুবায়ের (রা.) এমন অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন যখন তার নিকট কোন দিনার বা দিরহাম ছিল না, কিছু জমি ব্যতিরেকে যার মাঝে গাবাও ছিল। মদিনায় তার ১১টি বাড়ি ছিল। এছাড়া বসরাতে ২টি, কুফায় ১টি এবং মিশরে ১টি বাড়ি ছিল। হযরত যুবায়ের (রা.) যেভাবে ঋণগ্রস্ত হন তা হলো, মানুষ তার কাছে বিভিন্ন ধনসম্পদ আমানতস্বরূপ রাখতে আসতো, কিন্তু তিনি (রা.) বলতেন, এগুলো আমানত নয় বরং ঋণ হিসেবে নিবো, কেননা আমি তা নষ্ট হবার আশঙ্কা করি। আমি এগুলো আমানত হিসেবে রাখব না বরং ঋণ যেরূপ হয়ে থাকে আমি তোমার কাছ থেকে এগুলো সেভাবেই গ্রহণ করছি। তিনি তা থেকে খরচও করতেন। আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেটি থেকেও যেন তা সুরক্ষিত হয়ে যায় এ কারণে তিনি তাদের বলতেন, আমি এগুলো ঋণস্বরূপ গ্রহণ করছি যা আমি পরিশোধ করব। যাহোক, ঋণ পরিশোধের কারণে হোক বা রাজস্বের জন্য হোক অথবা অন্য কোন আর্থিক সেবার জন্যই হোক, হযরত যুবায়ের (রা.) কখনো সম্পদশালী হন নি। তবে তিনি (রা.) সর্বদা মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (রা.) জিহাদে অবশ্যই অংশ নিতেন, কিন্তু তিনি প্রচুর ধনী মানুষের ন্যায় নগদ অর্থ জমাতে পারেন নি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার তার ঋণের হিসাব করলাম যা ২২ লক্ষ ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে হযরত হাকীম বিন

হিযাম (রা.) সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার ভাইয়ের কী পরিমাণ ঋণ রয়েছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) তা গোপন করেন এবং বলেন, ১ লাখ। এটি শুনে হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার নিকট এই ঋণ পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট সম্পদ দেখতে পাই না অর্থাৎ বাহ্যত যে সম্পদ দৃষ্টিপটে ছিল তার কথা বলেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) তাকে বলেন, আর আমি যদি বলি, সেই ঋণ ২২ লাখ তাহলে আপনি কী বলবেন? এর উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাকে তা পরিশোধ করার মতো সামর্থ্যবান মনে করি না, তা পরিশোধ করা তোমার জন্য কঠিন। তুমি যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে না পার, তবে আমার সাহায্য নিও। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে আমি আছি। তুমি আমাকে বলবে আর আমি তা পরিশোধ করে দিব। হযরত যুবায়ের (রা.) গাবা (ভূখণ্ডটি) ১ লক্ষ ৭০ হাজার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) সেই জমি ১৬ লাখে বিক্রি করেন। তারপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, যার হযরত যুবায়ের (রা.)-এর কাছে পাওনা আছে সে যেন আমাদের কাছে গাবায় চলে আসে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) গাবার সেই জমি বিক্রয় করে ১৬ লাখ টাকা পান আর তারপর ঘোষণা দেন, যারা ঋণদাতা রয়েছে তারা নিজ নিজ ঋণের অর্থ বুঝে নিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর, যার হযরত যুবায়েরের কাছে ৪ লাখ পাওনা ছিল, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-কে বলেন, তোমরা চাইলে আমি এটি মাফ করে দিতে পারি অথবা চাইলে যেসব ঋণ তোমরা পরে দিবে বলে মনস্থ করেছ তার মাঝে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পার, অবশ্য যদি বিলম্বিত করার মনস্থ করে থাক। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন যে, না। তখন তিনি (রা.) বলেন, তাহলে আমাকে এক খণ্ড জমি দাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, ঠিক আছে, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত তোমার জমি। অর্থাৎ তিনি তা থেকে ঋণ পরিশোধ খাতে কিছু জমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর (রা.)-কে দিয়ে দেন। এই ঋণের মধ্যে সাড়ে চার ভাগ অবশিষ্ট থাকে। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট আসেন। সেখানে হযরত আমর বিন উসমান (রা.), হযরত মুনযের বিন যুবায়ের (রা.) এবং হযরত ইবনে যমআ (রা.) বসেছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করেন, গাবার মূল্য কত ধরা হয়েছে? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, প্রতি অংশ ১ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, কত অংশ অবশিষ্ট আছে? তিনি (রা.) বলেন, সাড়ে চার অংশ। তখন হযরত মুনযির বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি ১ লক্ষের বিনিময়ে একটি অংশ নিচ্ছি। অতঃপর হযরত আমর বিন উসমান (রা.) বলেন, আমি ১ লক্ষ দিয়ে একটি অংশ নিয়ে নিলাম। এরপর হযরত ইবনে যমআ (রা.) বলেন, আমিও ১ লক্ষ দিয়ে একটি অংশ নিয়ে নিলাম। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, আর কতটুকু রইল? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, দেড় অংশ। তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি দেড় লাখ দিয়ে তা নিয়ে নিলাম। অর্থাৎ অবশিষ্ট জমিটুকুও এভাবে বিক্রি করতে থাকেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর (রা.) তার অংশটি হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করে দেন। যাহোক, তিনি যে বলেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন, তো এভাবে আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সৃষ্টি করেন। তিনি তার কিছু কিছু সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হযরত যুবায়ের (রা.)'র সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা শেষ করেন তখন হযরত যুবায়ের (রা.)'র সন্তানরা বলে, ঋণ যা ছিল

তার সব পরিশোধ হয়ে গেছে, তাই আমাদের মধ্যে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করে দিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, না; খোদার কসম! আমি চার বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করব না। অর্থাৎ প্রথমে চার বছর পর্যন্ত প্রত্যেক হজ্জের দিন ঘোষণা করব যে, যুবায়েরের কাছে যার কোন পাওনা আছে সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। এরপর চার বছর পর্যন্ত তিনি হজ্জের সময় এ ঘোষণা করতে থাকেন। চার বছর অতিক্রান্ত হবার পর তিনি হযরত যুবায়েরের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন করে দেন। হযরত যুবায়ের (রা.)'র চারজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্ত্রীর প্রাপ্য এক অষ্টমাংশ চার স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেন আর প্রত্যেক স্ত্রী এগার লক্ষ করে পান। অর্থাৎ অন্যদের অংশ পরিশোধের পর অবশিষ্ট যে সম্পত্তি ছিল সেটি ভাগ করলে স্ত্রী'রাও প্রত্যেকে এগারো লক্ষ করে পান। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তার সাকুল্য সম্পদ ছিল **তিন কোটি বাহান্ন লক্ষ মূল্যমানের**। সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত যুবায়ের (রা.)'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ **ছিল চার কোটি**, যা বণ্টন করা হয়েছে।

হিশাম বিন উরওয়া (রা.) তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের (রা.)'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্যমান ছিল **পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ বা পাঁচ কোটি দশ লক্ষ**। অনুরূপভাবে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত যুবায়ের (রা.)'র মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া এবং কুফাতেও কিছু কিছু জমি ছিল। বসরাতে তার কিছু বাড়িঘর ছিল। মদিনার সম্পদ থেকেও তার কিছু আয় ছিল, যা তার কাছে আসত। যাহোক, তার সম্পদ থেকে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়।

মুতার্‌রেফ বলেন, একবার আমরা হযরত যুবায়ের (রা.)-কে বলি, হে আবু আব্দুল্লাহ্! আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছেন। আপনারা এক খলীফাকে হারিয়েছেন, তিনি শহীদ হয়েছেন। এখন আপনারা তার হত্যার প্রতিশোধের দাবি উত্থাপন করছেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান গণী (রা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতাম, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً (সূরা আনফাল: ২৬) অর্থাৎ, তোমরা সেই নৈরাজ্যকে ভয় কর যা শুধু তোমাদের সীমালঙ্ঘনকারীদেরই প্রভাবিত করবে না, বরং তা হবে সার্বজনীন। কিন্তু আমরা মনে করতাম না যে, তা আমাদের ওপরও বর্তাবে, আর আমাদের ওপরই এ পরীক্ষা এসে যাবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.)'র খিলাফত নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

যখন হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা ঘটে তখন মদিনায় অবস্থানরত সাহাবীগণ মুসলমানদের ভেতর নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে দেখে হযরত আলী (রা.)'র ওপর মানুষের বয়আত নেয়ার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে কিছু কুচক্রী কোনভাবে হযরত আলীর কাছে গিয়ে বলে, এখন ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে। আপনি মানুষের বয়আত নিন যেন তাদের ভয় দূর হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, তিনি বেশ কয়েকবার অস্বীকার করেন কিন্তু তাকে বয়আত গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষের বয়আত নিতে আরম্ভ করেন। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাহাবী তখন মদিনার বাইরে ছিলেন। কয়েকজনের কাছ থেকে জোর করে বয়আত

নেয়া হয়। যেমন হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে হাকীম বিন জাব্‌লা এবং মালেক বিন আশতারকে কতিপয় ব্যক্তিসহ পাঠানো হয় এবং তারা তরবারির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বয়আত করতে বাধ্য করেন। অর্থাৎ তারা তরবারি তাক করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, হযরত আলী (রা.)'র বয়আত কর, নয়তো এক্ষুণি আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। এমনকি কোন কোন বর্ণনানুসারে, তারা তাদেরকে একান্ত জোরপূর্বক মাটিতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। জানা কথা যে, এ ধরনের বয়আত কোন বয়আত বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। অতঃপর যখন তারা বয়আত করেন তখন এটিও বলেন, আমরা এই শর্তে আপনার বয়আত করছি যে, আপনি হযরত উসমান (রা.)'র হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন দেখেন যে, হযরত আলী হত্যাকারীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করছেন না, তখন তারা বয়আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মদিনা থেকে মক্কায় চলে যান। যারা হযরত উসমান (রা.)'র হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদেরই একটি দল হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)'র হত্যার প্রতিশোধের মানসে জিহাদের ঘোষণা দেয়ার কথা মানিয়ে নেয় আর তিনি (রা.) এর ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যান। এর ফলে হযরত আলী (রা.)'র সাথে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)'র যুদ্ধ হয়, যেটিকে উষ্ট্রীর যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধের প্রারম্ভেই হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মুখে মহানবী (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.) শুরুতেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তিনি হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার শপথ করেন আর এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি কথার অর্থ করতে ভুল করেছেন। অর্থাৎ ভুল বুঝেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রা.)ও মৃত্যু বরণের পূর্বে হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়আতের ঘোষণা দেন, কেননা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) আঘাতের তীব্রতায় ছটফট করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যায় আর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন দলের লোক? উত্তরে সে ব্যক্তি বলে, হযরত আলী (রা.)'র দলের। এতে তিনি (রা.) নিজের হাত তার হাতে রেখে বলেন, তোমার হাত হযরত আলী (রা.)'র হাত আর আমি তোমার হাতে দ্বিতীয়বার হযরত আলী (রা.)'র বয়আত করছি। যাহোক, হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত যুবায়ের (রা.)'র শাহাদত হয়েছে উষ্ট্রীর যুদ্ধ (ত্যাগ করে) ফিরে যাওয়ার পথে। সেখান থেকে তিনি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)'র সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেছিলেন, আমি ভুল করেছি, আর এ (যুদ্ধ) থেকে তিনি পুরোপুরি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি শহীদ হন। যখন হযরত আলী (রা.) তাকে স্মরণ করিয়ে বলেন, **আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছ যে, তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে আর অন্যায় হবে তোমার পক্ষ থেকে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আর একথা আমার এখনই মনে পড়েছে।** এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যান। হযরত আলী (রা.)'র সাথে যুদ্ধ না করার এটিই কারণ ছিল। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং মুনাফিকদের প্রজ্জ্বলিত আগুন যাতে অধিকাংশ সাহাবী ভুল বুঝাবুঝির কারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, যা-ই হয়ে থাকুক তা ভুল হয়েছিল।

হারব বিন আবুল আসওয়াদ বলেন, হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। নিজ বাহনে আরোহণ করে হযরত যুবায়ের (রা.) যখন সারিগুলো ভেদ করে ফিরে আসেন তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনার কী হয়েছে? উত্তরে হযরত যুবায়ের (রা.) তাকে বলেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি নিজ কানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেছিলেন, **তুমি তার অর্থাৎ হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর এ যুদ্ধে তুমি অন্যায়ের পক্ষে থাকবে।** এজন্য আমি তার সাথে যুদ্ধ করব না। তার ছেলে তাকে বলেন, আপনি তো মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এসেছেন আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে সন্ধি করাবেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি তো কসম খেয়েছি। এতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আপনি এই শপথের কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার কৃতদাস জারজাসকে মুক্ত করে দিন এবং এখানেই অবস্থান করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত যুবায়ের (রা.) তার কৃতদাস জারজাসকে মুক্ত করে সেখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু মানুষের মাঝে মতভেদ আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি (রা.) তার বাহনে আরোহণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। মদিনায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হযরত যুবায়ের (রা.) যখন বসরার নিকটবর্তী সাফওয়ান নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বনু মুজাশা গোত্রের বকর নামের এক ব্যক্তির সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, হে রসূলুল্লাহ্র হাওয়ারী! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই ব্যক্তিও হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাথে রওয়ানা হয় এবং আহ্নাফ বিন কায়েস নামের এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, ইনি হচ্ছেন যুবায়ের, তার সাথে আমার সাফওয়ান-এ সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন আহ্নাফ বলে, মুসলমানদের দু'দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তরবারি দিয়ে একে অন্যের শিরোচ্ছেদ করছে আর উনি যাচ্ছেন তার পুত্র ও পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে! উমায়ের বিন জারমূয, ফাযালাহ্ বিন হাবেস এবং নুফায়েল একথা শোনার পর বাহনে আরোহণ করে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পিছু নেয় এবং তাকে একটি কাফেলার সাথে ধরে ফেলে। উমায়ের বিন জারমূয ঘোড়ায় বসে পিছন থেকে এসে হযরত যুবায়ের (রা.)'র ওপর বর্শা দিয়ে আক্রমন করে এবং তাকে সামান্য আহত করে। হযরত যুবায়ের (রা.)ও তার ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন আর তখন তিনি 'যুল খিমার' নামক ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। ইবনে জারমূয যখন বুঝতে পারে যে, এখন সে মারা পরবে, তখন সে তার অপর দু'সঙ্গীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে আর তারা সম্মিলিতভাবে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত যুবায়ের (রা.) তার হত্যাকারীর মুখোমুখি হবার পর তাকে ধরাশায়ীও করে ফেলেন, তখন সেই শত্রু বলে, আমি আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছি। একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রা.) থেমে যান। এই ব্যক্তি কয়েকবার এ কাজ করে। কিন্তু সে যখন হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর তাকে আহত করে, তখন হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুন। তুই আমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছিলি, কিন্তু নিজে তাঁকে ভুলে গিয়েছিস। হযরত যুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করার পর ইবনে জারমূয হযরত যুবায়ের (রা.)'র ছিন্ন-মস্তক ও তার তরবারি নিয়ে হযরত আলী (রা.)'র কাছে আসে। হযরত আলী (রা.) তরবারিটি নিয়ে নেয়ার পর বলেন, **আল্লাহ্র কসম!**

এটি সেই তরবারি যার দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা থেকে উৎকণ্ঠার ছাপ দূর হয়েছে, কিন্তু এখন এটি মরণ ও নৈরাজ্যের মৃত্যুপুরীতে রয়েছে। ইবনে জারমূয ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে প্রহরী [হযরত আলী (রা.)-এর নিকট] নিবেদন করে, হযরত যুবায়ের (রা.)'র হত্যাকারী ইবনে জারমূয দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত যুবায়ের (রা.)'র হত্যাকারী ইবনে সাফিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হোক। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী রয়েছে আর আমার হাওয়ারী হলো যুবায়ের।** হযরত যুবায়ের (রা.)-কে 'সিওয়া' উপত্যকায় সমাহিত করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথিরা বসে তার জন্য অশ্রুবিসর্জন করেন। শাহাদতের সময় হযরত যুবায়ের (রা.)'র বয়স ছিল ৬৪ বছর। তবে কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৬৬ কিংবা ৬৭ বছর।

হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র সহধর্মিনী ছিলেন। মদিনাবাসীরা তার সম্পর্কে বলত, যে ব্যক্তি শাহাদত বরণের আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)-কে বিয়ে করে। সর্বপ্রথম তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বকর (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনিও শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। পরবর্তীতে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র সাথে তার বিয়ে হয়, আর তিনিও শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন।

হযরত যুবায়ের (রা.) শাহাদত বরণের পর হযরত আতেকা (রা.) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো বলেছিলেন,

গাদারুব্নু জারমুজিন বিফারিসি বুহ্মাহ, ইয়াওমাল্ লিকায়ে ওয়া কানা গাইরা মুআর্‌রেদ

ইয়া আমরু লাও নাব্বাহ্তাহু লাওয়াজাদ্তাহু, লা তায়েশান রায়েশাল জানানে ওয়া লালইয়াদ

শাল্লাত ইয়ামিনুকা ইন কাতালতা লামুসলিমান, হাল্লাত আলাইকা উকুবাতুল মুতাআম্মেদি

সাকেলাতকা উম্মুকা হাল যুফেরতা বিমিসলেহি, ফিমান মাযা ফিমা তারুহু ওয়া তাকতাদি

কাম গামরাতিন কাদ গাযাহা লাম ইয়ুছ্নেহ, আনহা তিরাদুকা ইয়াবনা ফাকে' কারদেদি

অর্থাৎ, যুদ্ধের দিন ইবনে জারমূয সেই বীর আরোহীর সাথে প্রতারণা করেছে, অথচ তিনি পলায়নকারী ছিলেন না। হে আমর বিন জারমূয! তুমি যদি তাকে অবগত করতে তাহলে তুমি তাকে এমন কাপুরুষের ন্যায় পেতে না যার অন্তর ও হাত কাঁপে, তোমার হাত বিকল হোক কেননা, তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছ। ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধের শাস্তি তোমার ওপর ধার্য হয়েছে। তুমি ধ্বংস হও। সেই যুগে যারা বিদায় নিয়েছে, তাদের মাঝে কি কখনো এই ব্যক্তির মতো অন্য কারো ওপর তুমি সফল হয়েছ যাদের মাঝে তুমি সকাল সন্ধ্যা কর? হে সেই ব্যক্তি যে সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারে না! যুবায়ের তো এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন তিনি যুদ্ধরত থাকতেন। আর হে গৌর বর্ণের মানুষ! তোমার বর্শা নিক্ষেপ তার কিছুই করতে পারত না।

তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে ইবনে জারমূয হযরত আলী (রা.)'র কাছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত আলী (রা.) তাকে (তার কাছ থেকে) দূরে

রাখতে চেয়েছেন অর্থাৎ তার সাথে দেখা করতে চান নি। এতে সে বলে, যুবায়ের কি বিপদের কারণ ছিলেন না? হযরত আলী (রা.) বলেন, **তোমার মুখে ছাই। আমি তো আশা করি, তালহা এবং যুবায়ের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,**

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (সূরা আল্ হিজর: ৪৮)

অর্থাৎ, আমরা তাদের হৃদয়ের যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করে দিব; তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে (উপবিষ্ট) থাকবে। হযরত যুবায়ের (রা.) বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন এবং তাঁদের গর্ভে অনেক সন্তানসন্ততির জন্ম হয়। এর বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ–

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), যার গর্ভে আব্দুল্লাহ্, উরওয়া, মুনযের, আসেম, খাদিজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান ও আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মে খালেদ (রা.), যার গর্ভে খালেদ, আমর, হাবীবা, সওদা এবং হিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যুবাব বিন উনায়েফ (রা.), যার গর্ভে মুসআব, হামযা ও রামলা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যয়নব উম্মে জা'ফর বিনতে মারসাদ (রা.), যার গর্ভে উবায়দা এবং জা'ফর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মে কুলসুম বিন আকওয়া (রা.), যার গর্ভে যয়নব জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হেলাল বিন কায়েস (রা.), যার গর্ভে খাদিজাতুস্ সুগরা জন্মগ্রহণ করেন। (আর ছিলেন) হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)। হযরত যুবায়ের (রা.)'র পুরো বৃত্তান্ত এখানেই সমাপ্ত হলো।

এর পর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, গাম্বিয়ার নায়েব আমীর তিন আলহাজ্ব ইব্রাহীম মুবায়ে' সাহেবের, যিনি গত ১০ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৪৪ সনের ৪ঠা জুন 'বাঞ্জুল'-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং (গাম্বিয়া) জামা'তের সাবেক আমীর মরহুম জনাব চৌধুরী শরীফ আহমদ সাহেবের যুগে ৬১-৬২ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। (তিনি) উক্ত জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। তার ছেলে বর্ণনা করেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বেও তাহাজ্জুদ নামায পড়েছিলেন। পান করার জন্য পানি চেয়েছিলেন, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হন। মরহুম পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মরহুম দীর্ঘদিন নায়েব আমীর হিসেবে ধর্মসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এর পাশাপাশি অফিসার সালানা জলসা, ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে খারেজা এবং গাম্বিয়ার মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর হিসেবেও কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়া মসরূর সেকেন্ডারী স্কুলের বোর্ড সদস্যও ছিলেন। অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজের পেশায় উচ্চশিক্ষা এবং মাস্টার্স করার জন্য আমেরিকা গমন করেন, এরপর ফিরে এসে দেশ ও জাতির সেবা করেন। গাম্বিয়ার একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্ট ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ছিলেন। গাম্বিয়াতে এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ পদস্থ সিভিল সারভেন্ট ও অন্যান্য লোকদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে থাকে। গাম্বিয়ার অনেক সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। প্রয়াত হাজী সাহেব তাহের আহমদীয়া মুসলিম সিনিয়র স্কুলের অধ্যক্ষ এবং নুসরত সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকও

ছিলেন। অনেক দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীকে তিনি পড়িয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষিত মহলে তাকে অনেক বড় মাপের (মানুষ) জ্ঞান করা হতো এবং মানুষ তাকে My Teacher (অর্থাৎ আমার শিক্ষক) বলে অভিহিত করত। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী এবং সাতজন পুত্র আর দু'জন কন্যা রয়েছে। তার একজন স্ত্রী মুসুকীবা সাহেবা গাম্বিয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর এবং তার এক পুত্র ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, যিনি জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে পাশ করেছেন। একইভাবে তার আরেক পুত্র খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। মরহুমের দুই ছেলে আমেরিকাতে আর এক মেয়ে এখানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও তার আকাঙ্ক্ষানুসারে সর্বদা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, অধমও ক্রাব আইল্যান্ডের মিডল স্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তার শিষ্য ছিল। এখানে সকল আহমদী শিক্ষার্থী অন্যান্য মুসলমান শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামীয়াত বিষয়ে একটি ক্লাস শুরু করেছিল আর মরহুম এই ক্লাসটি করাতেন। প্রয়াত হাজী সাহেব জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও কর্মকর্তাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। (আমীর সাহেব) বলেন, (মরহুম) আমার শিক্ষক ছিলেন তদুপরি আমীর হিসেবে সর্বদা আমার এবং অন্যান্য কর্মকর্তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী এবং মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। সর্বদা জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতিরক্ষায় অগ্রগামী থাকতেন। খুবই ভালো ধর্মীয় জ্ঞান রাখতেন, যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতেন। আর আধুনিক প্রযুক্তি ও বিভিন্ন মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বার্তাও পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন, তবলীগে রত থাকতেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, করাচীর নায়েব আমীর আব্দুল জলীল খান সাহেবের পুত্র জনাব নঈম আহমদ খান সাহেবের। তিনি মারা গেছেন প্রায় দু'তিন মাস হয়ে গেছে, এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে সর্বপ্রথম মোহতরম আখতার আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী হাসান আলী ভাগলপুরী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন। মৌলভী আখতার আলী সাহেব মরহুমের মায়ের মামা এবং পিতার ফুফা ছিলেন। নঈম খান সাহেব ভারতের বিহারের পাটনা থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন আর দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সনে লাহোরে চলে আসেন। দয়াল সিং কলেজ থেকে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন এবং লাহোরের টি আই কলেজ থেকে এমএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডন চলে যান এবং ১৯৫৯ সনে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর করাচীতে গ্যাস কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৩ সনে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পদে থাকা অবস্থায় সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। করাচীর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ায় সানাত ও তিজারত বিভাগের নায়েব নাযেম হিসেবে মরহুম জামা'তী সেবা আরম্ভ করেন। এরপর করাচীর স্থানীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব কায়েদ হিসেবে নিযুক্তি পান। অতঃপর ৬৬ সনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া করাচীর কায়েদ নির্বাচিত হন এবং চার বছর পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। করাচীর মার্টন রোড আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা ছিলেন। অতঃপর করাচী জেলার নাযেম আনসারুল্লাহ্-ও ছিলেন এবং ৯৭ সন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৭ সনে তিনি করাচীর আঞ্চলিক নাযেম আনসারুল্লাহ্ নিযুক্ত হন। এরপর তিনি করাচী

জামা'তের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নিযুক্ত হন এবং ২০১৯ সন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল করাচী জামা'তের নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া মরহুম ফযলে উমর ফাউন্ডেশন-এর ডাইরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদীয়া আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ারস (আহমদী স্থপতি ও প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক সংঘ)-এর প্রথম মজলিসে আমেলায় অডিটর হিসেবে সেবা করেছেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এর করাচী শাখার প্রধানও ছিলেন। ১৯৭০ সনে রাবওয়ার দারুয্ যিয়াফতের জন্য, বরং জলসা সালানার জন্য রুটি বানানোর মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় এবং মেশিন বানানো আরম্ভ হয়। তখন তিনি প্রকৌশলী হিসেবে উক্ত কাজে অংশগ্রহণের সম্মান লাভ করেন। নঈম খান সাহেবের স্ত্রী অনেক আগেই মৃত্যু বরণ করেছেন। তার কন্যা আম্মারা সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা আমাদের মায়ের মৃত্যুর পর একজন স্নেহশীল পিতার পাশাপাশি মমতাময়ী মা এবং সহানুভূতিশীল বন্ধুর ভূমিকাও উত্তমরূপে পালন করেছেন। সর্বদা ধর্ম, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা, নামাযে সময়ানুবর্তীতা এবং জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তার জামাতা ডাক্তার গাফ্ফার সাহেব বলেন, তার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছিল ত্রিশ বছর পূর্বে। এই ত্রিশ বছরে মরহুমকে অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তার নৈকট্য এবং সাহচর্য আমার জীবনে একান্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মরহুমের রীতিনীতি একান্ত পবিত্র এবং সরলতায় সমৃদ্ধ ছিল। ইবাদতের প্রতি তার মাঝে ঈর্ষণীয় একাগ্রতা ছিল। তার নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। শেষ দিনগুলোতে যখন পক্ষাঘাতের কারণে নিজে চলাফেরা করতে পারতেন না তখনও নিজের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন আসতে দেন নি আর তার যে পুরুষ নার্স ছিল, তাকে বলে রেখেছিলেন, আমাকে অমুক সময় উঠিয়ে বসিয়ে দিবে, আর এরপর তিনি চেয়ারে বসে রীতিমতো তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আরম্ভ করতেন, নামায পড়তেন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ল্যাপটপ-এ ধর্মীয় কাজও করে যেতেন।

জামা'তের মুরব্বী নাসিম তাবাস্সুম সাহেব বলেন, সর্বক্ষণ তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকত। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অবশ্যই অফিসে আসতেন। ওয়াক্ফে যিন্দেগীদের অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। তার সম্পর্কে আরেকটি কথাও রয়েছে। নরওয়ে থেকে যারতাশ্ত মুনীর সাহেব লিখেন, তিনি ধর্মসেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সর্বদা বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন জেলা কায়েদ হিসেবে সেবারত ছিলাম, তখন তিনি খুবই উন্নত পরামর্শ প্রদান করতেন, আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর আমি সর্বদা তাকে দেখেছি, প্রত্যেক আমীরের সাথে তিনি আনুগত্য এবং সহযোগিতার উন্নত মান বজায় রেখেছেন।

পরবর্তী জানাযা হলো, জার্মানীর ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা বুশরা বেগম সাহেবার, যিনি গত ১৯ জুলাই তারিখে ৭৪ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জার্মানীতে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার দাদা নাভা নিবাসী হযরত মিয়াঁ নিযামুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খুবই নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, সময়মতো নামায পড়তেন, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, অভাবীদের

সাহায্য করতেন, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শৈশব থেকেই দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে রীতিমতো পবিত্র কুরআন পাঠ করতে পারতেন না। কিন্তু বিয়ের পর নিজ সন্তানদের সাহায্যে কয়েক পারা মুখস্থও করেছেন। এমটিএ'তে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনার পাশাপাশি রীতিমতো আমার খুতবাও শ্রবণ করতেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও নিয়মিত দেখতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে চার পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। এক ছেলে শফিকুর রহমান সাহেব জামা'তের মুরব্বী এবং নিউজিল্যান্ড জামা'তের মুবাল্লিগ ইনচার্জ। আরেক ছেলে আতিকুর রহমান সাহেব আজকাল জীবন উৎসর্গ করে আমাদের পিএস দপ্তরের রেকর্ড বিভাগে কাজ করছেন। মিশনারী ইনচার্জ শফিকুর রহমান সাহেব তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণও করতে পারেন নি। তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও প্রশান্তি ও ধৈর্য প্রদান করুন এবং মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর মরহুমার সন্তানদেরকে তার দোয়া সমূহের উত্তরাধিকারী করুন। (আমীন)

নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)